বাংলাদেশ বিমান : পরিকল্পিত বিপর্যয়

৭০০ কোটি টাকার হাতছানি

বদরুল আলম নাবিল

‘বছর তিনেক আগের কথা, বিমানের গ্রুপ ক্যাপ্টেন জিলানী এবং তার এক সহযোগী গিয়েছিলেন ইন্দোনেশিয়ার এক বিমান মেলায়। সেখানে তিনি দেখতে পেলেন পরিত্যক্ত একটি এফ-২৮ বিমান। এই উড়োজাহাজটির অবস্থা এতই খারাপ ছিল যে অনেক দিন পরিত্যক্ত থাকায় ওটার মধ্যে ঘাস গজিয়ে গিয়েছিল। অথচ এই জাহাজটি বাংলাদেশ বিমানের অভ্যন্তরীণ রুটে চালানোর জন্য তিনি কিনতে চাইলেন। বিক্রেতা এর দাম চাইলেন ২০ লাখ ডলার। ক্যাপ্টেন জিলানী বললেন, না আপনি ৩০ লাখ ডলার দাম চান, ১৫ লাখ ডলার আপনি রাখবেন বাকি ১৫ লাখ ডলার আমাদের দেবেন।

ইন্দোনেশিয়ার এয়ারলাইন্স ব্যবসায়ী ভদ্রলোকটি এ প্রস্তাব শুনে যেনো পেয়ে গেলেন লজ্জাই। কারণ এর আগে এক ক্রেতা ১০ লাখ ডলার দাম বলেও আর প্লেনটি নেননি, প্লেনটির করুণ অবস্থা দেখে। বিক্রেতা ব্যবসায়ী এরপর ঢাকায় বাংলাদেশ বিমানে ফোন করলেন এবং বললেন, ‘তোমাদের লোকরা এরকম তিন গুণ বেশি দাম চাইতে বলে আমাকে লজ্জায় ফেলে দিয়েছে।’ কিন্তু তারপরও ক্যাপ্টেন জিলানী সেই উড়োজাহাজ ২৯ লাখ ডলারে কিনে ঢাকায় নিয়ে এসেছেন। আকাশে ওড়ার অনুপযোগী সেই বিমানটি উড়াতে খরচ করতে হয়েছে আরো কয়েক কোটি টাকা। এরপরও মাঝে-মধ্যেই বিকল হয়ে পড়ে বলে মেরামত করতে হয়। বর্তমানে এই এয়ারক্রাফটি বিমানবহরের জন্য একটি বোঝা হয়ে আছে। এই ঘটনা বিমান প্রতিমন্ত্রীসহ সরকারের সর্বস্তরেই জানাজানি হয়ে যায়। তারপরও ক্যাপ্টেন জিলানীকে বিষয়টি জিজ্ঞেস করার সাহসও কেউ পায়নি। ক্যাপ্টেন জিলানীর এত ক্ষমতার উৎস হচ্ছে, তিনি প্রধানমন্ত্রীর ভাই বাংলাদেশ বিমানের সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তি শামীম ইস্কান্দারের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়।’ এটি কোনো গল্প নয়, বরং সত্যি ঘটনা যা আমাদের শুনিয়েছেন বাংলাদেশ পাইলট অ্যাসোসিয়েশনের (বাপা) সাবেক সভাপতি ক্যাপ্টেন নাসিমুল হক। যদিও এই গল্পটি এর আগে-পরে বিমানসংশ্লিষ্ট আরো অনেকের কাছে শুনেছি। তবে তারা সকলেই তাদের উদ্ধৃত না করার জন্য অনুরোধ করেছেন।

সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা গেছে, স্বৈরশাসক এরশাদের সময় থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বিমানের এমন কোনো ক্রয় হয়নি, যেটি নিয়ে পুকুর চুরির অভিযোগ ওঠেনি। এটা এখন প্রতিষ্ঠিত সত্য হয়ে গেছে যে, প্রত্যেক সরকারের সময়ই বিমানে এক বা একাধিক বড় ধরনের কেনাকাটা করা হয় বড় অঙ্কের কমিশন পকেটস্থ করার জন্য।

তবে বিমানের ৩২ বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় কেনাকাটার জন্য এখন উঠেপড়ে

লেগেছে মন্ত্রণালয়, বিমান কর্তৃপক্ষ এবং সর্বোপরি সরকার। অর্থমন্ত্রী কয়েক মাস আগে সরকারি উচ্চ পর্যায়ের এক বৈঠকে বিমানের অদক্ষতা নিয়ে নানা ব্যঙ্গাত্মক কথা বলেছেন। এরপর কোনো এক অদৃশ্য জাদুর কাঠির পরশে সব পাল্টে গেল। এক মাস যেতে না যেতেই তিনি ৪টি নতুন এয়ারক্রাফট কেনার অনুমোদন দেন! এর মধ্যে তৎকালীন বিমান প্রতিমন্ত্রী বিদায় নিয়েছেন দুর্নীতি আর অযোগ্যতার অপবাদ মাথায় নিয়ে। সম্ভাব্য বিরাট অঙ্কের কমিশনের ভাগিদার হতে পারলেন না এই শোক ভুলতে তার বেশ কষ্ট হওয়ার কথা! তবে তারপর যিনি দায়িত্ব নিয়েছেন তিনিও পিছিয়ে নেই। একের পর এক বিমান বিকল হয়ে পড়ছে, ২/৩ দিন এমনকি ৮ দিন পর্যন্ত পিছিয়ে যাচ্ছে ফ্লাইট শিডিউল। এর ফলে বারবার যাত্রীরা পড়ছেন চরম দুর্ভোগে, অনেক প্রবাসী বাংলাদেশী দেশে এসে বিমানের এই শিডিউল পেছানোর কারণে নির্ধারিত সময়ে কর্মস্থলে গিয়ে যোগ না দিতে পেরে চাকরি হারাচ্ছেন। অন্যদিকে আটকে পড়া যাত্রীদের বিভিন্ন দেশের বিলাসবহুল হোটেলে আবাসন, খাওয়া এবং তারপর অন্য এয়ারলাইন্সে করে গন্তব্যে পৌঁছাতে গিয়ে বিরাট অঙ্কের টাকা গচ্চা দিতে হচ্ছে বিমানকে। এত কিছুর পরও নিরুদ্বেগ বিমানমন্ত্রী নিজ নির্বাচনী এলাকা ঠাকুরগাঁয়ে পড়ে থেকেছেন। তবে সেখানে থেকেও নতুন বিমান ক্রয় বা লিজ আনার প্রক্রিয়া কিভাবে আগাচ্ছে সেই খবর রেখেছেন বলে জানা যায়।

আর নেবেনই বা না কেন? তার পূর্বসূরি ১০টি নতুন বিমান কেনার জন্য সরকারের কাছে ১১০ কোটি ডলারের যে প্রস্তাব দিয়ে গেছেন, তাতে অর্থমন্ত্রী এর মধ্যে ৪টি বিমান কেনাতে সম্মতি দিয়েছেন। কোনো রকম বাণিজ্যিক পরিকল্পনা ছাড়াই কেন তড়িঘড়ি করে এই বিমান কেনার উদ্যোগ? অতীত অভিজ্ঞতা বলে মোটা অঙ্ক কমিশনের অর্থের হাতছনিই এই ক্রয়জজ্ঞের মূল কারণ। এবারের প্রস্তাবিত কেনা কাটায় টাকার পরিমাণ যেমন বড়, তেমনি সম্ভাব্য কমিশনের অঙ্কও যে বেশ বড়। ১১০ কোটি ডলারের কেনাকাটায় কত কোটি টাকা কমিশন পেতে পারেন এই কেনাকাটার সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা, তার একটা হিসাব করতে চেষ্টা করেছিলাম আমরা। অনুসন্ধানে জানা যায়, অতীতের বড় বড় কেনাকাটা নিয়ে যতগুলো অভিযোগ উঠেছে তার কোনোটিতেই কমিশন ২০ বা ২৫ শতাংশের কম ছিল না। তবে কখনো কখনো তা ৫০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড়িয়ে গেছে। বাপা'র সাবেক সভাপতি নাসিমুল হক সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেছেন, 'এই ক্রয় থেকে কমপক্ষে ৫০ শতাংশ কমিশন নেবে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা।' তার কথামতো, এত বেশি না ধরেও অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে যদি সর্বনিম্ন ২০ শতাংশ কমিশন হিসেবে হিসাব করা হয় তাতেও সাড়ে সাত হাজার কোটি টাকার এই

'কমিশনের আশায় বিমান কেনা হচ্ছে না, এসব বাকোয়াজ কথা'

মাহমুদুর রহমান

ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স

সাপ্তাহিক ২০০০ : বিমানের বর্তমান দুরবস্থার কারণ কি? এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য কি কোনো পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে?

মাহমুদুর রহমান : কারণ একটাই আমাদের বিমানগুলো পুরানো, বহরে নতুন বিমান দরকার। আমাদের ডিসি-১০ গুলো ২৮ বছরের পুরানো। ১০টি নতুন বিমান কেনার জন্য সরকারের কাছে একটি প্রস্তাব রয়েছে। এর মধ্যে বোয়িং ও এয়ার বাস দু'ধরনের বিমানই থাকবে। সরকার ৪টি বিমান কেনার বিষয়টি নীতিগত ভাবে অনুমোদন করেছে। দেখা যাক কি হয়। আর সাময়িক সমাধানের জন্য দুটি বিমান লিজ নেয়ার সিদ্ধান্ত হচ্ছে। তবে লিজিং প্রক্রিয়াও বেশ সময়সাপেক্ষ। সরকারের অনুমোদন নিতে হয়, তারপর ইন্টারন্যাশনাল টেন্ডার, বাছাই অনেক প্রক্রিয়া। এতেও প্রায় ৩/৪ মাস লেগে যায়। আমরা চেষ্টা করবো কত তাড়াতাড়ি এটা সম্পন্ন করা যায়। তবে আমাদের এখন নেতিবাচক ভাবতে হচ্ছে । রুট কমানো এবং ফ্রিকোয়েন্সি কমানোর কথা ভাবছি। আপাতত এটা ছাড়া উপা ও নেই। আমরা একটা নতুন শিডিউল করছি, কিছু রুট আপাতত বন্ধ করতে হবে।

২০০০ : অনেকে বলছেন নতুন বিমান কেনার দাবি জোরালো করার জন্যই পরিকল্পিত ভাবে একের পর এক বিমান বিকল করা হচ্ছে।

এম রহমান : এসব কথার কোন মানে হয় না।

২০০০ : আমাদের বিমান কয়টি এবং এগুলো কোনটি কি অবস্থায় আছে?

এম রহমান : ৫টি ডিসি-১০এর মধ্যে দুটি এখন উড্ডয়ন অক্ষম। হ্যাঙ্গারে আছে। চারটি এয়ার বাসের সবগুলোই যথাযথ ভাবে চলছে।

২০০০ : আপনি বলছেন যথাযথ ভাবে চলছে অথচ আমাদের কাছে তথ্য আছে গত প্রায় দু মাসে বিমানের কোন ফ্লাইটই নির্ধারিত সময়ে চলাচল করেনি। ২ ঘন্টা থেকে ৮ দিন পর্যন্ত দেরি হয়েছে?

এম রহমান : হঠাৎ করে কয়েকটি বিমানে যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়ায় এই অবস্থা হয়েছে। একটি বিমান খারাপ হয়েছে অন্যটি দিয়ে সেটির শিডিউল কাভার দিতে গিয়ে সেটির শিডিউল ফ্লাইট যথাসময়ে ছাড়তে পারছে না। এজন্যই আমরা কিছু রুট কমিয়ে দেয়ার মতো নেতিবাচক সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

২০০০ : ১০টি বিমান কিনতে কত টাকা প্রয়োজন হবে?

এম রহমান : আমরা ১.১ বিলিয়ন ডলারের প্রস্তাবনা দিয়েছি। এখন সরকারের সিদ্ধান্তের ব্যাপার।

২০০০ : নতুন এয়ার ক্রাফট কিনলে অবস্থার উন্নতি হবে বলে মনে করেন না অনেকেই। কারণ যখন বিমান বহরে তখনও বিমান লোকসান দিত। শিডিউল ঠিক রাখতে পারতো না। বলা হয় বিমানের কোন বিজনেস প্ল্যান নেই।

এম রহমান : আমরা আন্তর্জাতিক ১৭টি এয়ার লাইন্সের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে তাদের মধ্যে এমিরাটস, সাউদিয়া ও ব্রিটিশ এয়ারের মতো এয়ার লাইন্সগুলোও আছে। এসব বিমানের পজিটিভ দিক এগুলোও আপনারা লিখবেন আশা করি।

২০০০ : আপনি যাদের কথা বললেন তারা মুনাফা করছে আর বিমান ক্রমশ লোকসানের বোঝা ভারী করে চলছে। আমাদের দেশে বেসরকারি এয়ারলাইন্স জিএমজির সেবার মানও বিমানের চেয়ে বেশ ভালো।

এম রহমান : না এমিরেটস এয়ারলাইন্স মুনাফা করছে না। তারা লস দিচ্ছে। তবে এমিরেটস গ্রুপ ব্যবসা করছে।

২০০০ : বিমানে বর্তমানে প্রায় ৬ হাজার এমপ্লয়ি আছে ।এত লোকবল প্রয়োজন আছে কি?

এম রহমান : বিমানে এখন ৫ হাজার ৩০০'র মতো লোকবল আছে। একসময় আমাদের ১৭টি উড়োজাহাজ ছিল। এখন জাহাজ কমে গেছে বলে বেশি মনে হচ্ছে।

২০০০ : লোকসানের বোঝা ভারী হচ্ছে অথচ গ্রাহক সেবার মানও পড়ছে। আপনাদের কোন বিজনেস প্ল্যানও নেই। এ অবস্থায় শুধুমাত্র কমিশনের টাকার আশায় এই কেনাকাটা হচ্ছে এমন অভিযোগ আছে বলে বলা হয়?

এম রহমান : এসব বাকোয়াজ কথা। আমরা দেশে পতাকাবাহী এই প্রতিষ্ঠানটি সেবার মান বাড়াতে চাই বলেই বিমান কিনতে চাচ্ছি।

কেনাকাটায় কমপক্ষে সাড়ে ৭শ' কোটি টাকা কমিশন মিলবে।

একে একে নিভছে দেউটি

এক সময় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি জনপ্রিয় বিজ্ঞাপন- স্লোগান ছিল 'আকাশে শান্তির নীড়' কিন্তু বিমানের সেই আকাশে অশান্তির শকুনদের বিচরণ বেড়ে হাওয়ায় তা সংকুচিত হতে হতে আকাশ ছেড়ে মুখ থুবড়ে পড়ছে মাটিতে, কখনো বা ডোবানালায়। যেনো একে একে ঠাঁই নিচ্ছে 'পাতালে'। বছর তিনেক আগেও যেখানে বিমানের বহরে ১৭ টি উড়োজাহাজ ছিল, সেখানে এখন মাত্র ৪টি এয়ার বাস সচল আছে। ৬টি ডিসি-১০ বিমানের মধ্যে একটি চট্টগ্রাম বিমান বন্দরে ৬ মাস আগে দুর্ঘটনা কবলিত হওয়ার পর হ্যাঙ্গারে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে। বিমান কর্তৃপক্ষ এটিকে তাদের হিসাব থেকে বাদ দিয়েই রেখেছেন বলে জানিয়েছেন বিমানের ভারপ্রাপ্ত এমডি। হ্যাঙ্গারে আছে আরো একটি । বাকি ৪টির মধ্যে সম্প্রতি নিউইয়র্কগামী একটি ফ্লাইট ব্রাসেলসে এবং অপর একটি কুয়েতে বিকল হয়ে যাওয়ায় সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে বিমানের আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ রুটের শিডিউল। পরিস্থিতি এতটাই নাজুক হয়ে গেছে যে, এখন কোনো নির্ধারিত ফ্লাইট নির্ধারিত সময়ের কত ঘন্টা বা কত দিন পরে উড়বে তা খোদ বিমান কর্তৃপক্ষের পক্ষেও বলার উপায় নেই। বলবেই বা কি করে! গত দশ দিনেই বিমানের শতাধিক ফ্লাইটের সিডিউল বিপর্যয় ঘটেছে। বিমানের ফ্লাইট যাতে নির্বিঘ্ন চলতে পারে সেজন্য জাহাজ রক্ষণাবেক্ষণের দিকে তাদের নজর নেই, তাদের আগ্রহ একমাত্র কে কিভাবে পকেট ভারী করতে পারে। কেউ কেউ অভিযোগ করছেন, বিমান ক্রয়ের দাবিকে জোরালো করার জন্যই একের পর এক বিমান এভাবে পরিকল্পিতভাবে বিকল করা হচ্ছে। যাতে বিপুল অঙ্কের রাষ্ট্রীয় অর্থ হাতিয়ে নেওয়া যায়।

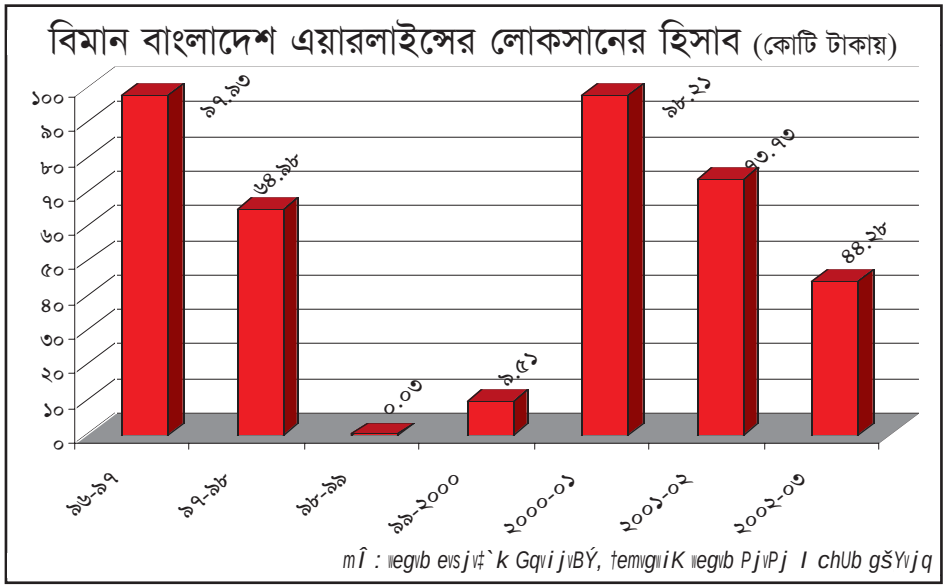

বাংলাদেশ পাইলট অ্যাসোসিয়েশনের (বাপা) সদ্য বিদায়ী সভাপতি ক্যাপ্টেন নাসিমুল হক ২০০০ কে বলেছেন, 'মোটা অঙ্কের কমিশন হাতানোর জন্যই এরা নতুন বিমান কিনতে চায় বা লিজ আনতে চায়। কিন্তু নতুন বিমান আনলেও তাতে কোনো লাভ হবে না। কারণ বিমানের কোনো বাণিজ্যিক পরিকল্পনা নেই। সকালবেলা উঠে মন্ত্রী যেভাবে বলেন, সেটাই হয় বিমানের সেই দিনের কাজ। একটা এয়ারলাইন্সের কমপক্ষে ৫ বছর মেয়াদি একটি বাণিজ্যিক পরিকল্পনা থাকবে। পাশাপাশি প্রকৌশলী, পাইলট ও এয়ার ট্রাফিকসহ সব বিভাগের একজন করে প্রতিনিধি নিয়ে একটি কমিটি থাকবে। এই কমিটি আলোচনা করে ঠিক করবে বিমানের বাণিজ্যিক পরিকল্পনা। মন্ত্রণালয় বা আরো ওপরের কোনো হস্তক্ষেপ চলবে না। মন্ত্রণালয় শুধু নীতিনির্ধারনী বিষয়গুলো ঠিক করবে, অন্যসব বিষয়ে তারা হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। কারণ মন্ত্রণালয়ের তো টেকনিক্যাল বিষয়গুলোতে জ্ঞান থাকে না। এভাবে যদি চালানো যায় তবেই শুধু বিমানকে বাঁচানো সম্ভব।'

কর্মবিমুখ প্রকৌশলীরা মত্ত বিলাসিতায়

একের পর এক বিমান বিকল হয়ে যাওয়ার জন্য নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন বর্তমান ও সাবেক বৈমানিক দায়ী করেছেন বিমানের ইঞ্জিনিয়ারদের। তাদের অভিযোগ, বিমান প্রকৌশলীরা বিমানে চড়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ান, এজন্য অতিরিক্ত অর্থ নেন আর বিভিন্ন দেশের পাঁচ তারা হোটেলে দিন কাটান। কিন্তু বিমানের রক্ষণাবেক্ষণের দিকে তাদের কোনো নজর নেই।

অভিযোগ আছে, বিমানের ইঞ্জিনিয়ারদের (গ্রাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার) মাঝে একদম পেশাদারি মনোভাব বলতে কিছুই নেই। তারা বেশির ভাগ সময়ই শুয়ে শুয়ে দিন কাটান দুবাই, কুয়েত, রিয়াদ, জেদ্দা, ব্যাংকক, মাস্কাট এসব শহরের

পিয়ন যেভাবে কোটিপতি

শোনা যায় দুবাইয়ে বিমান একজন বাঙালিকে পিয়ন হিসেবে লোকাল এমপ্লয়মেন্ট দিয়েছিল। বহু বছর ওই ভদ্রলোক দুবাইর বিমান অফিসে চাকরি করেছে। বিমানে চাকরি করে ওই পিয়ন ঢাকায় সাততলা একটি বাড়ি এবং মৌচাক মার্কেটে দুটি দোকানের মালিক হয়েছিল। অভিযোগ আছে যে, ওই ভদ্রলোক বিমান অফিসে কাজ করতো না। সে দুবাই মার্কেটে গিয়ে যেসব যাত্রী বাড়তি মালামাল নিয়ে বিমানে ভ্রমণ করবেন তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতো এবং দুবাইয়ের বিমান কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে বাড়তি মালামাল নামমাত্র অর্থের বিনিময়ে বহন করার ব্যাপারে মধ্যস্থতা করতো। বিমানের বাইরের সেক্টরগুলোর সবগুলোতেই কী এমন ধরনের পিয়ন আছে? এ সমাজে অনেক রাঘব বোয়াল আছেন, যারা এই বিমানকে অবলম্বন করে শত শত কোটি টাকার মালিক হয়েছেন।

অত্যন্ত বিলাসবহুল হোটেলে।

কোথাও অবতরণ করার পর ভালোভাবে চেকআপ করে বিমান যে ত্রুটিবিহীনভাবে উড্ডয়নক্ষম সে বিষয়ে নিশ্চয়তা দেয়ার জন্যে পরীক্ষা করে বইয়ে স্বাক্ষর করতে হয় ইঞ্জিনিয়ারদের। তা না করা পর্যন্ত পাইলটরা টেকঅফ করতে পারেন না। এই কাজটি করার জন্য বিমানের ইঞ্জিনিয়ারদের বাইরের স্টেশনে পোস্টিং নিয়ে সেখানে থাকতে হয়, নতুবা প্লেনের সঙ্গে যাত্রী হয়ে যেতে হয়। বিমানের ইঞ্জিনিয়ারদের বাইরের স্টেশনে পোস্টিং দেয়া হয় না। তাই প্লেনের সঙ্গে যাত্রী হয়ে যাওয়ার ব্যবস্থাই বহাল আছে বর্তমানে। এভাবে যাত্রী হয়ে যাওয়া-আসা করা ইঞ্জিনিয়ারদের বলা হয় 'রাইডিং ইঞ্জিনিয়ার'। বাইরের স্টেশনে গিয়ে প্লেন চেকআপ করা, মেইটেন্যান্স বইয়ে স্বাক্ষর করা, প্রয়োজনে যান্ত্রিক ত্রুটি ঠিক করা এসবকে বলা হয় কভারেজ দেয়া। যা বাংলাদেশ বিমানের প্রকৌশলীরা যথাযথভাবে করেন না বলে অভিযোগ আছে।

জানা গেছে, বিমানের ইঞ্জিনিয়াররা রাইডিং ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে গিয়ে বাইরের স্টেশনে কভারেজ দিয়ে যাত্রা বিরতিতে থাকা পাইলট ও অন্য ক্রুদের সঙ্গে চলে যান হোটেলে। এবং ক্রুদের মতোই দু'তিন দিন বিলাসবহুল হোটেলে অবস্থান করেন। তারা আর বিমানের পরবর্তী গন্তব্যে যান না। তাই অ্যারোপ্লেনের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উপযুক্ত ইঞ্জিনিয়ার আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

বিমানের ইঞ্জিনিয়াররা রাইডিং ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে ট্রাভেল করে বহির্বিশ্বের হোটেলে অবস্থান করতে কেন এমন প্রবলভাবে আগ্রহী? কারণ হিসেবে জানা যায়, দেশের বাইরে থাকলেই তারা দৈনিক ১৩০ ডলার পান ভাতা হিসেবে। তাতে কাজ করুক বা হোটেলে সময় কাটাক। প্রতিমাসে পাঁচ/ছয় দিন এভাবে বাইরের স্টেশনে থাকতে পারলে বাংলাদেশী মুদ্রায় ৪০ হাজার টাকার সমান অর্থ বাড়তি উপার্জন করতে পারেন।

জানা যায়, বাইরের স্টেশনে কভারেজ দেয়ার জন্যে বিমানে সব সময় দু'জন রাইডিং ইঞ্জিনিয়ার থাকেন, তারা বাইরের স্টেশনসমূহে দায়িত্ব পালন শেষে যাত্রাবিরতি করেন। অতীতে বিমান যখন এয়ারবাস প্লেনগুলো ক্রয় করলো তখন ওগুলো রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে এয়ারবাস কোম্পানির কয়েকজন ফরাসি ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। ওইসব ফরাসি ইঞ্জিনিয়ার শুধু একজনই রাইডিং ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে ঢাকা থেকে যাত্রা শুরু করে বাইরের একাধিক স্টেশনের কভারেজ দিয়ে কোথাও যাত্রাবিরতি না করে আবার ঢাকায় ফিরে আসতেন। ফরাসি ইঞ্জিনিয়াররা যেটা পারেন, সেটা বিমানের ইঞ্জিনিয়াররা কেন পারবেন না? তা পারার জন্য প্রয়োজনীয় ইনসেনটিভ হয়তো তাদের দেয়া যেতে পারে! এভাবে দায়িত্বে ফাঁকি দেয়ার পরও বিমানের প্রকৌশলী বা ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের কর্মচারীরা মূল বেতনের চেয়ে ২৫০% বেশি ওভারটাইম ড্র করে বলে অভিযোগ অন্যান্য বিভাগের কর্মরতদের।

সরকারের সময় শেষ হয়ে এসেছে, এ সময়ের মধ্যে এত বড় কেনাকাটার সকল প্রক্রিয়া শেষ করা যাবে কি না তা নিয়ে সন্দেহ দেখা দেয়ায়, সরকার এখন নতুন বিমান না কিনে লিজে বিমান আনার বিষয়টি বিবেচনা করছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ বিমানের একটি সূত্র। তবে এতেও কমিশন পাওয়া যাবে, পরিমাণটা হয়তো নতুন বিমান কেনার মতো তত বড় অঙ্ক নয়। এই যা পার্থক্য।

বিমান প্রতিবছরই কোটি কোটি টাকা লোকসান দিচ্ছে। ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরেও বিমান ২২ কোটি ৩৭ লাখ টাকা লাভ করেছিল। তারপর বছর থেকেই শুরু হয়েছে লোকসানের পালা। এখন প্রতিবছর বিমানের দৃশ্যমান লোকসানের পরিমাণই শত কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। দুর্নীতি ছাড়াও এই লোকসানের আরো একটি বড় কারণ বিমানের অতিরিক্ত লোকবল। বর্তমানে বিমানের লোকবল প্রায় ৫ হাজার ৩০০ জন। মাত্র আটটি বিমান পরিচালনার জন্য এত লোক দরকার হয় না। প্রতিটি সরকারই তাদের কিছু লোককে চাকরি দেয় বিমানে। এ নিয়োগ নিয়েও চলে কোটি কোটি টাকার লেনদেন। এভাবে অপ্রয়োজনীয় নিয়োগ দিতে দিতে বেড়ে গেছে বিমানের লোকবল। প্রয়োজনের অতিরিক্ত লোকদের কোনো কাজ না থাকায় তারা দল পাকায়, এতে বিমানের স্বাভাবিক কাজকর্মে সৃষ্টি হয় ব্যাঘাত।

বাংলাদেশ বিমান যেভাবে চলছে এভাবে কোনো এয়ারলাইন্স চলতে পারে না। দেশের পতাকাবাহী কোনো প্রতিষ্ঠান এভাবে চলা উচিত নয়। অবারিত দুর্নীতি বন্ধ করে একটি দক্ষ ব্যবস্থাপনা গড়ে না তুললে একে আর ভর্তুকি দিয়েও বাঁচিয়ে রাখা যাবে না, এমন অভিমত অভিজ্ঞ মহলের। এজন্য বিমানকে ক্রমশ বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ছেড়ে দেয়ার কথা গুরুত্ব দিয়ে ভাববার সময় এসেছে।

write2nabil@gmail.com

'এদের উদ্দেশ্য চুরি করা, বিদায়ের আগে যে যা পারে ভাগ বাটোয়ারা করে নিয়ে যাবে'

নাসিমুল হক
সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ পাইলট অ্যাসোসিয়েশন

সাপ্তাহিক ২০০০ : বিমানের বর্তমান দুরবস্থার জন্য দায়ী কারা?

নাসিমুল হক : বিমানের কোনো বিজনেস প্ল্যান নেই। সকাল বেলা মন্ত্রী ঘুম থেকে উঠে যা বলেন সেটাই বিমান সারাদিন পালন করে, পরের দিন আবার যা বলেন সেভাবেই চলে। এভাবে কোন এয়ারলাইন্স চলতে পারে না। অন্তত ৫ বছর মেয়াধি একটি পরিকল্পনা নিয়ে এগুতে হয় বিমানকে। এদের আগামী একদিনের পরিকল্পনাও হাতে নেই। সব সময়ই কিছু অযোগ্য লোক এনে বিমানের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তারা এয়ারলাইন্সও বোঝে না, এভিয়েশন কমার্স বোঝে না। এরা আসে পকেট ভারী করতে। মীর নাছির সাহেব বিমানের সর্বশেষ সর্বনাশ করে গেছেন। চট্টগ্রাম সিটি নির্বাচনে হারার পর তিনি সিঙ্গাপুর গিয়েছিলেন। বলেছিলেন চিকিৎসার জন্য যাচ্ছেন। কিন্তু তিনি আসলে তার কমিশনের টাকা যা সেখানে জমা হয়েছিল তা আনতে গিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর ভাই শামীম ইস্কান্দারও মাঝে মধ্যে সিঙ্গাপুরে যান তারটা আনতে। এখন আবার নতুন বিমান কেনার কথা বলে লুটপাটের আরেক ক্ষেত্র তৈরি করা হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে দেশের পতাকাবাহী এই প্রতিষ্ঠানটি আর টিকে থাকবে না। তারা নতুন বিমান কিনতে চায়, সেগুলো কিনে তারা কি করবে? তাদের কোনো পরিকল্পনা আছে? সাধারণ মানুষের এত কোটি কোটি টাকা খরচ করা কেন? এদের উদ্দেশ্য চুরি করা। বিদায়ের আগে যে যা পারে ভাগ বাটোয়ারা করে নিয়ে যাবে। এই ক্রয় যদি আপনারা লিখে না বন্ধ করেন তবে যে দামে কেনা হবে তার অর্ধেকই দেখবেন ওরা খাবে।

২০০০ : বলা হয় বিমানে প্রয়োজনের অতিরিক্ত লোকবল আছে। এমন কি পাইলটের সংখ্যাও বেশি?

নাসিমুল : পাইলটের সংখ্যা এখন ১৫০-এর মতো হবে। সর্বমোট ৫ হাজারের মতো লোক আছে বিমানে। বিমান থেকে শামীম ইস্কান্দাররা যদি ১.২ বিলিয়ন ডলার নিয়ে নিতে পারে, সেখানে ৫ হাজার পরিবার যদি এখানে কাজ করে বাঁচে তাতে সমস্যা কোথায়? বেশ কয়েক বছর আগে বিচিত্রায় একটা কার্টুন ছাপা হয়েছিল বিমানকে সকলে কাঁচি ছুরি দিয়ে কেটে খাচ্ছে। এটাই বিমানের আসল চিত্র।